জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

আহমদ শরীফের সাহিত্যভাবনা

এ কে এম মাহবুবুল হক*

Abstract

Among more than three hundred articles by Ahmed Sharif, a notable number narrates his assessment, analysis and thoughts about the fundamental issues of literature along with the process and nature of Bangla literature. Ahmed Sharif took part in the contemporary literary discourse like utiliterian-aesthetic, mass-bourgeoisie debate; as well as, states his views on the practice of Bankim-Rabindranath-Nazrul under the influence and interest of contemporay socio-political perspective. Inspired and enriched by non-communal humanistic tradition of Bangla and Bangalee, progressive and socialist thinker Ahmed Sharif is valiant, impassive and exceptional in expressing his opinion. In the current discussion, Ahmed Sharif's views on theoritical aspects like creation, forms or aims of literature has been analyzed in order to aggregate his notion on it. In case of analysis, Ahmed Sharif's relevant articles and interviews have been considered as the primary sources and the critics of some other writers have been accepted as secondary sources.

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) শৈশব থেকেই পরিবার-প্রযত্নে পেয়েছেন সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার ঋদ্ধ পরিবেশ, শুনেছেন উৎসাহী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের আলোচনা। তাঁর জ্ঞানাভিলাষী চেতনাজগতের পথ-প্রদর্শক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও প্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান, কৃতিত্ব ও গৌরবের ওপর বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা আহমদ শরীফকে দিয়েছে 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্থায়ী অভিধা'[১]। তবে সমসাময়িক সাহিত্য, সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ববহ; কারণ তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা ও রাজনীতিবোধ আহমদ শরীফের সাহিত্যভাবনায় প্রাধান্য পায়। দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের কারণে সাহিত্যের বিষয়-বিষয়ীতে যে পরিবর্তন সূচিত ও প্রত্যাশিত হয় আহমদ শরীফ তার অভিনিবেশী পর্যবেক্ষক। সমাজ-প্রগতির সাথে নিয়ত অভিযোজনকামী আহমদ শরীফের চিন্তাজগতের এই বিবর্তন প্রক্রিয়া ও প্রবণতা ব্যাখ্যা করে আহমদ কবির লিখেছেন—

> তাঁর প্রবন্ধ-চিন্তা ক্রমশ সাহিত্যের তত্ত্ব, সৌন্দর্য ও ইতিহাস বিশ্লেষণের এলাকা অতিক্রম করে দেশ ও সমাজের সমস্যা ও সংকট কিংবা সমকালীন চালচিত্র উন্মোচনে অধিক প্রবণতা দেখিয়েছে। ডক্টর আহমদ শরীফ সমাজতান্ত্রিক শ্রেয়োবাদী চিন্তার লোক। গণমানবের কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর কাম্য। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় নানা সমস্যা ও সংকট উদ্ভূত হওয়ার জন্য তিনি গণবিরোধী দেশি বিদেশি অশুভ চক্রকেই দায়ী করেছেন এবং এইসব নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তীব্র ভাষায়–কখনো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে, কখনো দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামে।[২]

পঞ্চাশের দশকে, মহান ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে জাতীয়তাবোধের স্ফটিকায়ন, দেশ-রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল বাঙালির জাতীয় সাহিত্য নির্মাণের গতিপথ অনুসন্ধানে।[৩] পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের চিন্তাচর্চায় আহমদ শরীফ যে বিপুল মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেখান থেকে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা, বোধ ও জিজ্ঞাসার উত্তর, প্রত্যয় ও সূত্রের সন্ধান করা এবং সে-অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। আহমদ শরীফের প্রায় পাঁচ

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দশকের সৃষ্টিশীল সাহিত্যেষণায় রচিত তিন শতাধিক প্রবন্ধ-সম্ভার থেকে কেবল সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনাকে বিবেচনায় নিয়ে মূলত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আহমদ শরীফের সাহিত্য-ভাবনাকে বিষয় বিবেচনায় তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নেয়া যায়––

ক। সাহিত্যের রূপ-রীতি-উদ্দেশ্য-বিশেষত্ব আলোচনা।
খ। বাংলা ভাষা ও বাঙালির ইতিহাসের আলোকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা।
গ। সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন।

উল্লিখিত তিন বিষয়ভুক্ত প্রবন্ধসমষ্টি থেকে বর্তমান আলোচনায় প্রধানত সাহিত্যের রূপ-রীতি-উদ্দেশ্য-বিশেষত্ব নিয়ে আহমদ শরীফের মতামত বিশ্লেষণ করে তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিরূপণে এবং শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় এই মতামত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ ও সাহিত্যবোধের উৎস

আহমদ শরীফের মতে সাহিত্য-শিল্প হচ্ছে 'কী ভাবছি তা নয়, ভাব কীভাবে প্রকাশ করছি তা-ই'।[৪] অর্থাৎ বিচিত্র ভাবনার সমারোহ নয়, প্রকাশশৈলীই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে মানবমন ও মানবজীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মানবপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে সৃষ্ট চরিত্র অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার, অদৃষ্টবাদ. নিয়তিনির্ভরতা, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব যে মানুষের আচরণকে বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তা না জানলে সজীব ও স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি হয় না, 'এক কথায় মানুষের প্রতিমুহূর্তের বাহ্যাচরণ ও জীবন-প্রচেষ্টার মধ্যে মনুষ্যজীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তির যে অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে, তার যথার্থ স্বরূপ না জানলে বা কারণ-ক্রিয়া জ্ঞান না জন্মালে কোনো রচনাই শিল্পায়ত্ত হবে না।'[৫] সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব বাংলায় নতুন রাষ্ট্র, ভূগোল ও জাতিত্ব-জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মোন্নয়নকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন তিনি। কারণ এই আত্মোন্নয়ন ব্যক্তির হলেও তা সমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাহিত্য, যার নাম গণসাহিত্য, সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। সাহিত্যের ও জীবনের সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক বিবর্তন ধারায় ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আহমদ শরীফের রচনায় পাওয়া যায়। তিনি মানবমনীষার ঋদ্ধি-বিকাশের সাথে সাহিত্যের রূপকল্প ও রসকল্পের বিবর্তন-ধারা ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি স্তরে, প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত যার বিস্তার—

প্রথম স্তরে বিস্ময়দৃষ্টি : প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টির প্রতি মানবমনের বিস্ময়াবদ্ধ ও রহস্যাবৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে বর্বরযুগের মানুষ দিয়েছে চকিত, বিস্মিত, ভীত, ত্রস্ত ও উল্লসিত দৃষ্টি। এই আত্মপ্রবোধ ও আত্মপ্রসাদের গুণে সৃষ্টি হয় রূপকথা, পুরাণ।

দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞান : জ্ঞানের বিকাশে মানুষের মধ্যে যে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠল কল্পলোকের সঙ্গে ইহলোক যুক্ত হয়ে এসময় গড়ে উঠল রোমান্সসাহিত্য বা মহাকাব্য।

তৃতীয় স্তরে সূক্ষ্ম জীবনবোধ : এ স্তরের মনুষ্যমনের প্রতিচ্ছবি পাই রোমাঞ্চময় বা রোমান্টিক সাহিত্যে। বাস্তব জীবনের পাওয়া-না-পাওয়া হৃদয়ের স্বরূপ, জীবনের সাধ-আহ্লাদ, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রসাদ অভিব্যক্তি পায় এই সাহিত্যে।[৬]

সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্য চিরকালই বাস্তবজীবনভিত্তিক। তাই দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সাহিত্য অসম্ভব। মানুষের জীবনবোধের অনুকূল সাহিত্যই চিরকাল মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই বাস্তবতায়, সাহিত্যের টিকে থাকা বা স্থায়িত্ব নির্ভর করে বিষয়ের ওপর নয়, লেখকের সৃষ্টিক্ষমতার ওপর। কারণ বিষয় চিরন্তন নয়, আদর্শও 'সাময়িক সমস্যা-নির্ভর' ; তাহলে বাকি থাকে লেখকের সৃজনক্ষমতা–– আহমদ শরীফ যেমন বলেন, 'শিল্পীর গৌরব এবং সৃষ্টির স্থায়িত্বও নির্ভর করে সম্পূর্ণ শিল্পকৌশলের উপর– বিষয়বস্তু বা আদর্শের উপর নয়।'[৭]

সাহিত্যের প্রকারভেদ ও রসবৈচিত্র্য

বৃহত্তর তাৎপর্যে সাহিত্য ব্যক্তির জীবনচৈতন্য, ব্যক্তির অনুভূতির অভিব্যক্তি। অনুভূতি হলো ভাবের সত্য, যা মনের বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করে এবং তা বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ নয়। আবার জীবনচৈতন্য হলো বাহ্য-পরিবেশের সাথে মনের গভীরতর যোগ-চৈতন্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, বাহ্য-পরিবেশের যোগ ও জীবনচৈতন্য মিলে যে ভাবের অভিব্যক্তি তা-ই সাহিত্য। সাহিত্যে জীবনচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য গভীরভাবে যুক্ত। লেখকের জীবনচেতনাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য যেহেতু ভাবসর্বস্ব তাই সাহিত্যে বাস্তব বা কল্পনাসর্বস্ব, প্রয়োজনানুগ বা রসানুগ, গণসাহিত্য বা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে কোনো বিভাজন থাকা উচিত নয় বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। যেহেতু সৃষ্টি মাত্রই কল্পনাধর্মী এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব, সে-কারণে সাহিত্যস্রষ্টার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধ-বুদ্ধি, রুচি-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্যভেদে সাহিত্যের রসবৈচিত্র্য ঘটে। সাহিত্যে বস্তুভেদে অনুভূতিভেদ থাকতে পারে, রসগত স্তরভেদ থাকতে পারে কিন্তু এই তারতম্য সাহিত্যকে ভিন্ন নামে বিচ্ছিন্ন বা পরিচিত করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ লিখেছেন––

> মূলত মানুষের জীবন ভাবসর্বস্ব বা অনুভূতি-সমষ্টি মাত্র। কাজেই অনুভূতির জগতে স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রবণতানুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং মনোভঙ্গির পার্থক্যবশতই আমরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে ও রসে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা টানতে প্রয়াসী হই। আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা ও মতগত অনৈক্যের মূলও এখানে। সাহিত্যে রস-সর্বস্বতা, জীবন-সর্বস্বতা, সমাজ-সর্বস্বতা, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা বা প্রয়োজন-সর্বস্বতা বলে কিছুই নেই—যা আছে তা অনুভূতি ও উপলব্ধির সর্বস্বতা। এর প্রকার-ভেদেই আদর্শ, নীতি, রস ও বিষয়-ভেদ ঘটে।[৮]

অর্থাৎ সাহিত্যের প্রকারভেদ বলতে আদর্শ-নীতি-রস বা প্রয়োজনের প্রকারভেদ বোঝায় না, আহমদ শরীফ মনে করেন, এটি অনুভূতি ও উপলব্ধির বিভিন্নতা। প্রয়োজনের সাহিত্য, কেজো সাহিত্য, গণসাহিত্য যে নামেই অভিহিত হোক না-কেনো তা অস্থায়ী সংগ্রামী সাহিত্য মাত্র— স্থায়ী রস-সাহিত্য নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হলে বুর্জোয়া সাহিত্য, কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য তথা রসসাহিত্যের পুনরাবির্ভাবই পরিণতি। তবে পুনরাবির্ভাব মানে পুনরাবর্তন নয়, সেই সাহিত্যও নতুন সাহিত্যই বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। সময়ের প্রয়োজন ও বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী সমাজভাবনার প্রসারের কালে গণসাহিত্য আহমদ শরীফকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু গণসাহিত্য তাঁর কাছে কেবল প্রয়োজনমুখ্য মনে হয়েছিল বলেই রসসাহিত্যকেই তিনি সাহিত্যের অভীষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু এখানেই জিজ্ঞাসার ইতি টানেননি। উপযোগবাদী সাহিত্য ও রসসাহিত্যের ধারা আর্থসামাজিকব্যবস্থা-উদ্ভূত। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় চর্চিত আনন্দদায়ী সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই উদ্দেশ্য বলে গণ্য করে, অন্যদিকে আধুনিক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় গণমানুষের সর্বজনীন ও সামষ্টিক কল্যাণার্থে নির্মিত সাহিত্যকে গুরুত্ব দেয়, যা গণসাহিত্য নামে পরিচিত। আহমদ শরীফ মনে করেন– 'বুর্জোয়ার আনন্দের সাহিত্যের পাশাপাশি পরাধীন নির্যাতিত শোষিত মানুষের বেদনা, বিক্ষোভ ও সংগ্রামের সাহিত্যও থাকবে।' এবং 'দুটোই রসময়; একটি কেবল উপভোগের

জন্যে আর একটি নিছক উপলব্ধির জন্যে। একটির রস হয়তো যথার্থই মধুর, অপরটি ভিন্ন নামে কষ–– যা কলিজা-নিঃসৃত এবং প্রথমে লাল ও পরে কালো।'[৯]

অনুভূতিজাত উপলব্ধিই সাহিত্যের চরম কথা; তাই সাহিত্যকে উপভোগের বস্তুও বলা যায়। ব্যাখ্যা করে বুঝে নেয়া বা বুঝিয়ে দেয়ার বস্তু সাহিত্য কোনোভাবেই নয়।[১০] যে-কোনো লিখিত রচনাই সাহিত্য নয়, আবার কোন্ গুণে লেখা সাহিত্য মর্যাদা পায় তা-ও সহজে বিশ্লেষণসাধ্য নয়। এই মর্যাদা তথা সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতা বিষয়বস্তুর উচ্চতা-তুচ্ছতার নিরিখে বিচার্য নয়। এর লক্ষণ, পরিস্ফুটন, আস্বাদ্যতা প্রতিফলিত হয় সহৃদয়-হৃদয়সংবেদী পাঠকের চিত্তে।

সাহিত্য-শিল্পের রসনিষ্পত্তি-ধারণা যেমন প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ, সৌন্দর্য ও প্রয়োজন-চিন্তার পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্কও তেমন অমীমাংসিত ও সবসময়ই প্রাসঙ্গিক। আহমদ শরীফ প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না, তবে সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতার জন্য কেবল প্রয়োজনকেই মুখ্য বিবেচনা করার পক্ষেও তিনি নন। বরং কোনো কোনো পর্যায়ে কেবল প্রগতির নামে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষতিসাধনের সমালোচনা করতেই দেখি আহমদ শরীফকে। যেমন 'বঙ্কিম-মানস' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন––

> কিন্তু আমাদের প্রয়োজনবোধের শেষ নেই। এ কারণেই পুরোনো সাহিত্যে আমরা সৌন্দর্যের সাথে নৈতিক বা ধার্মিক আদর্শের প্রতিফলনও কামনা করেছি। ন্যায়ের জয় ও অন্যায় বা অধর্মের ক্ষয় দেখবার আগ্রহই প্রধানত পাঠক বা শ্রোতাকে সাহিত্যরসিক করে তুলত। এ-যুগের পাঠক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ খোঁজে। আমরা ভুলে যাই যে এ Utility হচ্ছে আনুষঙ্গিক তথা by product। তাই এর উপরই সব গুরুত্ব দিলে সাহিত্য-শিল্প গৌণ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কাঞ্চন ফেলে আঁচলে গেরো দেয়ার বিড়ম্বনাই ভোগ করতে হয়। আজ পাঠক-সমালোচক সাহিত্যে সেই বিড়ম্বনা-জালই বিস্তার করছেন। তাই কথায় কথায় পশ্চাৎমুখিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতিবাদিতা সাড়ম্বরে উচ্চারিত হয়।[১১]

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

আহমদ শরীফ আদর্শবাদিতার প্রচারের বিনিময়ে সাহিত্যের ক্ষতি সমর্থন করেন না। কারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করেই শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। কথা যেখানে শেষ সেখান থেকেই সুরের শুরু; নকশার বর্ণনা অতিক্রম করে সূচনা হয় সাহিত্যের। আহমদ শরীফ শিল্পকলার তথা মানুষের সৌন্দর্যচিন্তার উৎস বিচার করে লিখেছেন––

> কলা মাত্রেই কৃত্রিম। তুচ্ছকে উচ্চ করে তোলা, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করা, কৌৎসিত্যে লাবণ্য দেয়া, সরলকে জটিল করা ঋজুকে বক্র করে তোলা, সামান্যকে অসামান্যতা দেয়া, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা কলা-শিল্পীর দান। যা নেই তা সৃজন করা, যা কাম্য তা পাইয়ে দেয়াই শিল্পীর দায়িত্ব। অতএব, স্বাভাবিকতায় শিল্প নেই। অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্পকলা। তাই শিল্পীমাত্রেই স্রষ্টা এবং স্রষ্টা কখনো অনুকারক হতে পারেন না। অথবা কোনো অনুকারকই স্রষ্টার সম্মান পান না। অতএব সৃষ্টি মাত্রেই মৌলিক।[১২]

এভাবে প্রয়োজন অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা পায় সৌন্দর্য। তাতে মনে হতে পারে আহমদ শরীফ কলাকৈবল্যবাদী কিন্তু এই প্রয়োজনাতিরিক্ততার মধ্যেও সমাজজীবনের প্রায়োজনিক যোগসূত্র অস্বীকার করা যায় না সেটাও তিনি বিবেচনায় রাখেন। কারণ কোনো কিছুই প্রয়োজন-নিরপেক্ষ হতে পারে না, কোনো প্রয়োজনই জীবনসংগ্রাম ব্যতিরেক নয়। মানুষের কর্ম বা আচরণ তার মানস ও ব্যবহারিক জগতের কোনো-না-কোনো প্রয়োজনাপেক্ষ বলেই আহমদ শরীফ 'শিল্পের জন্য শিল্প' ধারণার বিরোধী। তিনি প্রয়োজন ও কর্মের সাথে সৌন্দর্য ও আনন্দের যোগসূত্রে উদ্ভূত শিল্পকলায় আস্থাবান। তাঁর মতে, 'Art for art's sake' কথাটা বাজে এবং তাতে ইতিহাসের সমর্থন বা শিল্পবোধের পরিচয়

নেই। কিন্তু বুর্জোয়ার কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য যে তিনি একেবারে বাতিল করেন না এই প্রমাণ অন্যত্র তাঁর বক্তব্যে আমরা পাই। তিনি মনে করেন, এই সাহিত্যস্রষ্টা 'গণশত্রু'র কাতারে না হলেও 'গণবন্ধু' নয়। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ভাব বা উপলব্ধি সঞ্চারকে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য মনে করেন বলেই কলাকৈবল্যবাদী তথা বুর্জোয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি আহমদ শরীফ, অথচ 'মানসজীবনের বিকাশ সাধনের এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটানোর সহায়ক হওয়াতেই সাহিত্য-শিল্পাদি কলার সার্থকতা ও সফলতা'[১৩] এই প্রত্যয় থেকেও তিনি সরে আসেন না।

আহমদ শরীফের মতে, জাতীয় সাহিত্য পরিচয়ে কোনো সাহিত্য কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং প্রয়োজনের সঙ্গে মানুষের অবিকল্প সম্বন্ধ শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যান্বেষার নিয়ন্ত্রক। তিনি মনে করেন, সমাজবদ্ধ মানুষের দুঃখ নিবারণ, স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, উন্নততর মানসাভিযাত্রা সবই আধুনিক শিল্পপ্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি ভবিষ্যতের জন্য নতুন সৃষ্টিক্ষম শিল্পীর কামনা করেছেন। যেহেতু 'মানুষের চিন্তা-ভাবনা পুরাতনকে স্বরূপে ও স্বস্থানে ধরে রাখার জন্যে নয়, পুরাতনের প্রয়োজন মতো বর্জন, শোধন ও নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্যেই।'[১৪] অতএব শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও প্রসারণ। পুরোনো সমাজকে ভেঙ্গে–– অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন জাগানো, পরিকল্পনা প্রদান; চালু সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও নতুন সংস্কৃতি সৃজন; যে-ঐতিহ্য প্রগতির অন্তরায়, অনুপ্রেরণা দানে অক্ষম, তা পরিহার করে নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান, সৃজন প্রভৃতিই হবে শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আদর্শ, লক্ষ্য ও ব্রত।[১৫] অর্থাৎ শুধু বাস্তবাবস্থার নকশা আঁকা বা সমাজসত্য রূপায়ণ নয়, ভবিষ্যতের কাম্য নির্দেশনাও সাহিত্যিক ও শিল্পীর দায়িত্ব। দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির এই অভিন্ন অবস্থান গড়ে তুলতে হলে শিল্পীমনে প্রীতি ও প্রত্যয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। কারণ প্রীতিহীন হৃদয়ে মানবকল্যাণ, সমাজগঠন ও ভবিষ্যৎ-কল্পনা অসম্ভব––

> অতএব দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনের যোগসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ-সংস্কৃতির রূপ এঁকে দেয়া। এজন্যে বাক্‌জাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যাণপ্রসূ দিক উদঘাটিত হলেই এ উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। প্রীতি ও প্রত্যয়ই এ কর্মে সাফল্যের সম্বল। কেননা প্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দু-ই অসার্থক।[১৬]

সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও দর্শন মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিকাশের সহায়ক। মনুষ্যত্বের ও মানবতার অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের জন্যে এগুলোর চর্চা ছিল প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে-প্রয়োজন ও দায়িত্ব স্বীকার করেনি কখনও।

'শিল্প বনাম উপযোগ' : আত্মার খোরাক ও মুক্তির অন্বেষা

আহমদ শরীফ উপযোগবাদী ও কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যের তুলনা করেছেন 'কেজো-অকেজো' রূপকল্প ব্যবহার করে।[১৭] তিনি উপযোগমুখ্য তথা 'কেজো' সাহিত্যের বিপরীতে সৌন্দর্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় রচিত রসমুখ্য 'অকেজো' সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। সাহিত্যের কোনো প্রকারকেই অস্বীকার বা বাতিল করেননি তিনি, তবে উপযোগবাদী সাহিত্যের প্রসারের যুগে কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যের মহিমা বর্ণনা করেছেন।[১৮] কেজো সাহিত্যও প্রকৃত আদর্শ সাহিত্য বা উৎকর্ষের মানদণ্ড হতে পারে না। 'যে-কারণে ফটো চিত্রকলা নয়, নক্সা সাহিত্য নয়, সে-কারণেই কেজো সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়'।[১৯] 'প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে তোলা এবং খণ্ড, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে সমগ্রতার মর্যাদা ও গুরুত্ব দানই সাহিত্যের কাজ'[২০] বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। সে হিসেবে কেজো সাহিত্য স্থূল ও বড় বেশি সাময়িক তবে উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাহিত্যের রূপভেদ যা-ই হোক না কেন, মানবিক বোধ ও আদর্শচেতনাই স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবযুক্ত মন ও মননের ভিন্নতায় সমানুভূতির অনুপ্রেরণা

হতে পারে। আমাদের সমাজ বুর্জোয়া সাহিত্যের আনন্দোপকরণে মুগ্ধ কিংবা গণমানুষের সংগ্রামী সাহিত্যে প্রবুদ্ধ থাকতে পারে, তবে ভিন্নতা থাকলেও সাহিত্যের দুই রূপই রসময়–– কারও 'আত্মার খোরাক' কারও 'মুক্তি অন্বেষা'–– একটি উপভোগের জন্য অপরটি উপলব্ধির।[২১]

লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কে

আহমদ শরীফ লেখকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ১৯৪৭ সালের বিভাগোত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ-নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে বাংলাদেশের তৎকালীন লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীগণ বিক্ষোভে-সংক্ষোভে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। আহমদ শরীফ এ সময় গণমানুষের মুক্তির কথা সাহিত্যে তুলে ধরার জন্য শাসকগোষ্ঠীর সকল পীড়ন উপেক্ষা করে শিক্ষিত 'মসি সংগ্রামী'র ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। 'মসি সংগ্রামীর সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি সে আহ্বান জানিয়েছেন––

> আজকের দুনিয়ায় নিপীড়িত মানুষের জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে চাই বাক-স্বাধীনতার আন্দোলন, আর এজন্যে চাই শিক্ষিত বয়স্ক মধ্যবিত্তের সহানুভূতি এবং তরুণ মধ্যবিত্তের সমর্থন, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সহায়তা এবং লিখিয়েদের উচ্চ ও নির্ভীক কণ্ঠ এবং অবিচলিত কলম। এ ব্যাপারে সমর্থন ও সহযোগিতাই শক্তির উৎস।[২২]

শিল্পীর স্বাধীনতা যাতে কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় সার্থক সাহিত্য-পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এটি প্রধান শর্ত। লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সাহিত্য সৃষ্টির উৎসমুখ আখ্যা দিয়ে আহমদ শরীফ এই স্বাধীনতাকে সাহিত্যের জন্য আবশ্যক গণ্য করেছেন। তাঁর মতে যা রসায়ত্ত, যা অন্যজনকে প্রভাবিত করে তা যে-মতেরই হোক না কেন, টিকে থাকবে। 'সাহিত্যে আদর্শবাদ বা অর্ডিন্যান্স' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন––

> সেজন্যেই সাহিত্যে যে-কোনো মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং বিশেষ আবশ্যক––তা ঈশ্বরবাদ হোক, অথবা ব্যক্তিবাদ, সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ বা ধর্মবাদ হোক! এর মধ্যে যা রসায়ত্ত, যা সাহিত্য তা টিকে থাকবে, অন্য দশজনকে প্রভাবিতও করবে; যা নিঃসার তা যাবে––আবর্জনার মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকা পড়বে, তার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।[২৩]

তবে তিনি ফরমায়েশি সাহিত্য তথা প্রচারধর্মী বা আজ্ঞাবহ লেখার প্রবল বিরোধী। আহমদ শরীফ আমৃত্যু লেখকের চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনবোধ ও উপযোগবুদ্ধি বিভিন্ন বৈচিত্র্যে প্রকাশ লাভ করে। 'জীবন, সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন––

> সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দর্শনে জীবনবোধের ও জীবনদৃষ্টির প্রকাশ বিচিত্র ও বহুধা। এজন্যেই শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনকে জাতীয়, ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা সামাজিক রূপ দেয়ার নির্দেশ দান নির্বুদ্ধিতায় পরিচায়ক। কেননা জীবনবোধ ও উপযোগবুদ্ধি ফরমায়েশে তৈরি হয় না। চেতনানুসারেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম অভিব্যাপ্তি পায়। ফলে কেউ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কেউ ধর্মীয় বোধে অনুপ্রাণিত, কেউ সমাজচিন্তায় বিব্রত, কেউবা জীবনের নৈতিক গুরুত্বে আস্থাবান। তাই সবাইকে নির্দেশে নিবর্ণ করার অভিপ্রায় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মননের দৈন্যপ্রসূত। মানুষ মেশিন নয়, কাজেই তার কাছে অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্মের পৌনপুনিকতা কিংবা অভীষ্ট রূপ বা ফল, আশা করা বাতুলের দিবাস্বপ্ন মাত্র।[২৪]

আহমদ শরীফ মানুষের হৃদয়ে সৌন্দর্যচিন্তার উৎপত্তি, প্রকাশরীতি ও লক্ষ্য নিয়ে কোনো দার্শনিক বিতর্ক সূচনা করেননি। তবে তাঁর মতামত অনেকাংশে মার্কসবাদী সাহিত্যচিন্তারই অনুকূল। তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকদের মতো সমাজ ও গণমানুষের জন্য কল্যাণকর সাহিত্য সমর্থন করেন,

কিন্তু 'প্রলেতারীয় নীতিতত্ত্বের'[২৫] মতো মতবাদের বাঁধাধরা নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ থাকা সমর্থন করেন না। তিনি মার্কসবাদীদের মতো আধার ও আধেয় উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন; লেখক ও পাঠকের শ্রেণি-অবস্থান, সাহিত্যে সর্বজনীনতা এবং সামগ্রিকতাকে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সাহিত্যে রূপভেদ থাকতে পারে কিন্তু প্রকারভেদ নয়।[২৬] গণসাহিত্যের প্রচারধর্মিতার আদর্শকে আহমদ শরীফ 'ছোটো আদর্শ' মনে করেন না বরং 'প্রচারপত্রিকা' নামে সমালোচিত হলেও গণসাহিত্যকে তিনি বুর্জোয়া সাহিত্যের তুলনায় সাম্প্রত ও নন্দিত বলেই গণ্য করেন। তবে, গুরুত্ব দেন লেখকের শক্তি ও লেখার বিষয়বস্তুর ওপর; সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য বিবেচনায় গণসাহিত্যকেও হতে হবে সার্থক রসসৃষ্টি ও জীবনকে উপভোগের সহায়ক।[২৭] গণসাহিত্যের মতো জাতীয় সাহিত্য একটি জাতির অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হওয়া স্রোত ও আত্মপরিচয় বহন করে। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির বাস্তবতায় তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার বিপরীতে জাতীয় সাহিত্যের রূপরেখা তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। উদ্দেশ্য ছিল মূলত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পরিবর্তে উর্দুর প্রচলন, বাংলা ভাষার ব্যবহারে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ এবং জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইসলামি তহজিব-তমুদ্দুন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা। সেই লক্ষ্যে সফল হলে জাতীয় পরিচয় ও জাতিত্বের পরিচয়কে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা আচ্ছাদিত করে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কার-কৃষ্টিকে হত্যা করা যায় সহজে। বস্তুত ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশীয় একশ্রেণির সাহিত্যিকের উৎসাহী অংশগ্রহণে জাতীয় সাহিত্য বিনির্মাণের নামে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সংকীর্ণ ধর্মীয় বিবেচনায় বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের'[২৮] মোড়কে জাতীয় সাহিত্যের ষড়যন্ত্র রুখতে প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান। সে-সময় যাঁরা এই প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানে অংশ নিয়েছিলেন আহমদ শরীফ তাঁদের একজন। 'পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ' প্রবন্ধে তিনি সেসময়ের বাস্তবতা তুলে ধরলেন এভাবে––

> চারদিক থেকে ধ্বনি উঠছে––ইসলামী সাহিত্য চাই। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলামী-তমদ্দুন-তাহজীব, ঐতিহ্য-আদর্শ প্রতিফলিত করাই হবে আমাদের সাহিত্যিকদের ব্রত। কিন্তু আমাদের কবির দল (দু'একজন ছাড়া) তবু কাস্তে, লাঙ্গল, ধানক্ষেত, লড়াই আর বুভুক্ষু নিয়েই গুরুদের সাগরেদি করছেন। প্রমাণ–– সদ্য প্রকাশিত নবীন কবিদের কবিতা-সংকলন 'নতুন কবিতা' বইখানি। খুঁজলে অতি সহজেই কারণের সন্ধান মিলবে। প্রথমতঃ আমাদের মনে বা মাথায় কোথাও ইসলাম নেই, যদিও আমরাই ইসলমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি সব চেয়ে শক্ত করে।[২৯]

ইসলামি মূল্যবোধকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলার মাধ্যমে জনজীবনের সাথে সাহিত্যের সংযোগ স্থাপন করা এবং সে-অনুযায়ী জাতীয় সাহিত্যের অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে আহমদ শরীফের পরামর্শ একপ্রকার সমন্বয়ধর্মী। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে বিস্তর গবেষণার ফলে তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছেন জাতীয় সাহিত্যে ইসলামি-ভাবধারা পরিস্ফুটনের গুরুত্ব কিন্তু তা বাঙালির হাজার বছরের নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস বা অস্বীকার করে নয়। বাংলা সাহিত্যের পরিচয় পেতে হলে বাঙালির পরিচয় নিতে হবে––এ ঘোষণা তিনি আগেই দিয়েছেন। তাই সাহিত্যে ঐতিহ্যের ব্যবহারে ইসলামি ভাবধারা ও ভারতীয় পুরাণের রূপপ্রতীক প্রয়োগে কোনো অধর্ম দেখেননি তিনি, কারণ 'কোনো ভাষাতেই ধর্মীয় 'রূপ' থাক্‌তে পারে না, থাকে ধার্মিকভাব।... আরবি ভাষায়ও আল্লাহ্‌র নিন্দা করা যায়, আবার সংস্কৃত ভাষায়ও আল্লাহ্‌র বন্দনা সম্ভব।'[৩০] আহমদ শরীফ ঐতিহ্যের নামে অতীতমুখিতার প্রবল সমালোচক, ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জনে যুক্তিবাদী ও ইতিহাসাশ্রিত, নতুন শিল্পপ্রয়াসকে স্বাগত জানাতে উন্মুখ। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যে ঐতিহ্যের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তা পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষণ

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ঐতিহ্য নিরূপণে ধর্মীয় বিভেদাত্মক স্বাতন্ত্র্য সন্ধানই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় আহমদ শরীফ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে সাহিত্যের ঐতিহ্য-প্রসঙ্গে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ঐতিহ্যকে পুরনো সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামান্তর আখ্যা দিয়ে তিনি লিখলেন-- 'ঐতিহ্য সচেতনতার ও পুরোনো সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আমাদের আজকের সাহিত্যের অপূর্ণতা ও দীনতার অন্যতম কারণ।'[৩১] এই ঐতিহ্য বলতে তিনি বুঝিয়েছেন স্বদেশের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা জীবনের ঐতিহ্য যা 'পূর্বপুরুষের অর্জিত বা সৃষ্ট কিংবা কৃতির ফসল। ধর্মীয় জীবন হচ্ছে বাইরের থেকে পাওয়া আদর্শের কৃত্রিম রূপায়ণ। তাই দেশী ঐতিহ্যকে অবহেলা করে কেবল ধর্মীয় কিংবা ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে পাওয়া বিদেশী ঐতিহ্যের প্রয়োগে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা হবে তাসের ঘরের মতো অকেজো ও অসার্থক। তা কখনো হবে না প্রেরণার কিংবা অনুভবের উৎস।'[৩২]

উপসংহার

আহমদ শরীফের সাহিত্যভাবনা গণমানুষ, সেক্যুলারিজম এবং মানবতাবাদ এই তিন আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। টলস্টয়ের মতো সাহিত্যের সর্বজনীনতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে; সর্বমানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতা হয়েছে তাঁর পাথেয়।[৩৩] তাঁর সাহিত্যভাবনা শুরু থেকেই উপযোগবাদ এবং শ্রেয়োচিন্তার সম্মিলন। তবে সাহিত্যচর্চার শুরুতে উপযোগের চেয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। ক্রমান্বয়ে কেবল সৌন্দর্য নির্মাণের ফাঁকি থেকে সরে গিয়ে প্রয়োজনকে মুখ্য মেনেছেন, কিন্তু প্রয়োজন শেষ হলেই যে সৌন্দর্যের মহিমা উদ্ভাসিত হয় এই প্রত্যয়কেও গুরুত্ব দিয়েছেন বারবার। নিজের লেখায় জগৎ-জীবন সম্পর্কে নির্বিশেষ মন্ময়ভাবনা থেকে দ্বেষ-দ্বন্দ্বময় সবিশেষ বস্তুপৃথিবীর হিতচিন্তাকেই প্রাধান্য দিতে থাকেন তিনি।

মার্কসবাদ আহমদ শরীফের প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সর্বত্র কিন্তু সেখানে বাঁধা পড়েননি কখনও। তাই সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাতন্ত্র্যের নামে ভেদবুদ্ধির সাহিত্য তিনি বর্জনীয় মনে করেছেন সবসময়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর লেখকগণও এই বিবেচনা থেকে বাদ পড়েননি। সাহিত্যের সাথে সাহিত্যিকের জীবনযাপনপ্রণালীর যোগসূত্র, সাহিত্যিকের শ্রেণি অবস্থান, সমাজবোধ ইত্যাদি আহমদ শরীফের সাহিত্য-মূল্যায়নে এতটাই গুরুত্ব পায় যে, কখনও কখনও সাহিত্যবিচার সামগ্রিক না হয়ে হয় খণ্ডিত। আমাদের বিবেচনায় সমগ্রতাসন্ধানী সমালোচক স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিকর্মের সব দিক থেকে সূত্র নিয়ে সেগুলিকে যুক্ত করে তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আহমদ শরীফের বিশ্লেষণে হয়তো সামগ্রিক চিত্রটি অস্পষ্ট থাকে, মন্তব্য হয়ে যায় প্রধান, ধারণাকে খণ্ডিত মনে হয়; তবে এক্ষেত্রে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মত সমর্থন করে বলা যায়, তাঁর 'বক্তব্যে অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পূর্ণতাপ্রয়াসী'।[৩৪] নিজস্ব কোনো সাহিত্যতত্ত্ব হাজির করেননি আহমদ শরীফ, কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে তাঁর আস্থাও নেই। এমনকি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে, তাঁর ভাষায়, 'প্রভাব-তত্ত্ব'ও[৩৫] তিনি অস্বীকার করেন; উপযুক্ত মনে করেন না তুলনামূলক আলোচনার ধরনও। কারণ সেখানেও 'বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও গভীরতাজাত মূল্যায়ন' অবহেলিত হয়।[৩৬] আহমদ শরীফ নিজের মত নিজেই খণ্ডন করে নতুন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়-সমাজ-পরিপার্শ্ব ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এসব পরিবর্তন হয়েছে, উদাহরণ-- মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ও পরের রবীন্দ্র-বঙ্কিম-নজরুলবিবেচনা, গণসাহিত্য-জাতীয়সাহিত্য, কেজো-অকেজো সাহিত্যচিন্তার বিবর্তন। তবে নিজের পরিবর্তিত মত প্রকাশে তিনি কোনো দ্বিধা রাখেননি, সংকোচও করেননি কখনও।

সাহিত্যকর্মের গুণ-শৈলী-উপকরণ তথা কাঠামোগত বিশ্লেষণের পরিবর্তে আহমদ শরীফ অধিকতর উৎসাহী ছিলেন বিধৃত বিষয় ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজসংগঠনের মিথষ্ক্রিয়া পর্যালোচনায়। সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। সময় ও

ইতিহাসের গভীরতাভেদী পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আহমদ শরীফের আয়ত্তে ছিল। বিষয়ের অন্তস্তল-গভীরতা পর্যন্ত সবকিছুকে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যাচাই ও বাছাই করে নিতে পারতেন। দ্রুত সংশ্লেষ ও প্রত্যয়ে উপনীত হওয়াই তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এজন্য অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও বর্ণনাও পরিহার করেন তিনি। তবে আহমদ শরীফের সাহিত্য সমালোচনায় লেখার চেয়ে লেখক, সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক সময় লক্ষ্য হয়ে যায় বিধায় কোনো কোনো মূল্যায়ন প্রকৃত সাহিত্যগুণ বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে তিনি হয়তো জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে জ্ঞান-চাঞ্চল্য তৈরি করতে পারেন সহজেই কিন্তু বিঘ্নিত হয় গভীরতাসন্ধানী পাঠকের প্রত্যাশা। তাই আহমদ শরীফ সবসময়ই অনুসন্ধানী ও মতভিন্নতা-উৎসুক পাঠকের স্বস্তির আনন্দ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ কবির, *আহমদ শরীফ* (ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০১৩), পৃ. ৬৯

২. আহমদ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩. প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *বিচিত-চিন্তা*-য় (১৯৬৮) প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই ১৯৫২ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে প্রকাশিত।

৪. আহমদ শরীফ, 'কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু', *আহমদ শরীফ রচনাবলী (খণ্ড-১)*, আহমদ কবির সম্পাদিত (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১৮

৫. তদেব।

৬. আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা', তদেব, পৃ. ৩১-৩২

৭. আহমদ শরীফ, 'গণসাহিত্য', তদেব, পৃ. ২৫

৮. আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', তদেব, পৃ. ৪৩

৯. আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব', তদেব, পৃ. ৫৩১, ৫৩২

১০. তদেব, পৃ. ৪৫

১১. আহমদ শরীফ, 'বঙ্কিম-মানস', তদেব, পৃ. ১৭২

১২. আহমদ শরীফ, 'জীবন, সমাজ ও সাহিত্য', তদেব, *পৃ.* ২৭৩

১৩. আহমদ শরীফ, 'আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে', তদেব, পৃ. ৫৩৩

১৪. *তদেব, পৃ. ২৭৪*

১৫. *তদেব।*

১৬. *তদেব, পৃ. ২৭৫*

১৭. *বিচিত-চিন্তা* (১৯৬৮) গ্রন্থভুক্ত 'কেজো ও অকেজো সাহিত্য'।

১৮. আহমদ শরীফ, 'কেজো ও অকেজো সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ.

১৯. তদেব, পৃ. ৯

২০. *তদেব*।

২১. *আহমদ শরীফ*, 'সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব', *তদেব*, *পৃ.* ৫৩১

২২. *তদেব*, *পৃ.* ২৭৭

২৩. *তদেব*, *পৃ.* ৪৬-৪৭

২৪. *তদেব*, *পৃ.* ২৭৩

২৫. 'প্রলেতারিয়েতের বিকাশে ও বিজয়ে যা সহায়ক তা-ই ভাল–– যা ক্ষতিকারক তা-ই খারাপ।' –– লুনাচরস্কি, ' মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচনা : কতিপয় প্রস্তাব', *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, সংকলন ও অনুবাদ- সাঈদ-উর রহমান(ঢাকা : একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৬৪

২৬. আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী (খণ্ড-১)*, প্রাগুক্ত, 'সাহিত্যের স্বরূপ', পৃ-৪৪

২৭. আহমদ শরীফ জাতীয় সাহিত্য ও গণসাহিত্য নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য– 'শিল্প-সাহিত্যে গণরূপ' , 'গণসাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা', ' বুর্জোয়া সাহিত্য বনাম গণসাহিত্য'। বিস্তারিত–– *আহমদ শরীফ রচনাবলী (খণ্ড-১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, ২৮-৩০, ৩৪, ৪৪, ৪১৫

২৮. হুমায়ুন আজাদ, 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ', *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা : ইউপিএল, ২০০০), পৃ. ১-১১

২৯. আহমদ শরীফ, উদ্ধৃত–– হুমায়ুন আজাদ, তদেব, পৃ. ৮

৩০. আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যে রূপপ্রতীক', *আহমদ শরীফ রচনাবলী (খণ্ড-১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩১. আহমদ শরীফ, 'আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান', তদেব, পৃ. ৭২

৩২. তদেব, পৃ. ৭৩

৩৩. 'সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'অতএব ভাষা বা ভঙ্গি, কাহিনী বা বিষয়, গৌরব বা লজ্জা, ক্ষোভ বা উল্লাস, বিশ্বাস বা সংস্কার, আদর্শ বা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কিংবা সমস্যা হবে স্থানিক, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকবে সর্বমানবিক। অর্থাৎ স্থানিক ও কালিক বিষয় হবে সাহিত্যের বহিরঙ্গ আ অন্তর্নিহিত রস হবে সর্বজনীন।' দেখুন–– তদেব, পৃ. ৫৪২

৩৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'আহমদ শরীফ : প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা ও প্রবণতা', *আচার্য আহমদ শরীফ* (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৬), পৃ. ১০৯

৩৫. কোনো লেখকের লেখাকে বিভিন্নভাবে এর-তার প্রভাব হিসেবে দেখানোর সমালোচনাপদ্ধতিকে আহমদ শরীফ 'প্রভাব-তত্ত্ব' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে–– 'সমমর্মিতাজাত সাদৃশ্য মাত্রই প্রভাব নয়' এসবে গুরুত্ব দিলে 'আদমের কাল থেকে পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হয়েছে প্রতিটির প্রভাব জন্মকাল থেকে প্রতিটি মানুষের উপর পড়েছে তা-ও উল্লেখ করতে হবে।'

দেখুন– 'পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল', ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা (সম্পাদিত), *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, খণ্ড-৬ (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১৯০-১৯১

৩৬. তদেব, পৃ. ১৯৫